সুরক্ষিত শিশু স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধ রাষ্ট্র: হাম নির্মূলে চাই সমন্বিত প্রয়াস

একটি জাতির টেকসই উন্নয়নের মূলে রয়েছে তার সুস্থ ও কর্মক্ষম জনশক্তি। আজকের শিশুরাই আগামীর সেই জনশক্তি। কিন্তু বর্তমানে হামের মতো সংক্রামক ব্যধির প্রাদুর্ভাব সেই ভবিষ্যতের পথে এক বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, হাম কেবল সাধারণ কোনো জ্বর বা র‍্যাশ নয়। এটি সঠিক সময়ে প্রতিরোধ না করলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক পঙ্গুত্ব থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

হাম হলো অতি সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ যা বায়ুর মাধ্যমে দ্রুত ছড়ায়। যদি কোনো এলাকায় ৯৫% এর কম শিশু টিকার আওতায় থাকে, তবে প্রাদুর্ভাব সেখানে মহামারির রূপ নিতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন এবং জনঘনত্বের কারণে শহরাঞ্চলে হামের ঝুঁকি আরও বাড়ছে, যা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে গভীর উদ্বেগের।

WHO ও UNICEF এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা গুলোর তথ্যমতে, হামের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক লড়াইয়ে বড় ধরনের সাফল্য যেমন রয়েছে তেমনি পাশাপাশি নতুন উৎকণ্ঠাও তৈরি হয়েছে।

২০০০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে হামের টিকাদান কর্মসূচি বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫ কোটি ৯০ লাখ মানুষের মৃত্যু রোধ করেছে। এত

অগ্রগতি থাকা সত্ত্বেও ২০২৪ সালে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৯৫০০০ মানুষ হামে মারা গেছে, যাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই ছিল ৫ বছরের কম বয়সী শিশু। পরিসংখ্যান বলে ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ মানুষ হামে আক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানে ১৩৮টি দেশ হামের প্রাদুর্ভাবের সম্মুখীন এবং ৬১টি দেশ বড় ধরনের সংক্রমণের শিকার হয়েছে।

WHO এর মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৪ জেলার মধ্যে ৫৮টি জেলায় অর্থাৎ ৯১ শতাংশ জেলায় রোগী পাওয়া গেছে। ফলে সংক্রমণ ক্রমাগত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

সন্দেহভাজন ১৬৬টি শিশুর মৃত্যুর তথ্য সম্পর্কে জানা যায়, যারা মূলত টিকা না পাওয়া দুই বছরের কম বয়সী।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে বর্তমানে প্রশ্ন উঠছে। কারণ, চার বছর পর বুস্টার ডোজ কিংবা দেশব্যাপী এক ডোজ টিকাদান ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবার কথা থাকলেও সর্বশেষ ২০২০ এর পরে আর ক্যাম্পেইন করা হয়নি। টিকাদানও রাখা হয় বন্ধ। পরবর্তী সময় এই টিকাদান কর্মসূচীই বন্ধ থাকে। ফলে দেশ এখন এক ভয়াবহ সংক্রামক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

২৫ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত কেবল উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয় ১৯৮ জন শিশুর।

১৫ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ১৯ হাজার ১৬১ জন সন্দেহভাজন রোগীর তথ্য পাওয়া গেছে। টেস্টে নিশ্চিত হওয়া গেছে ২ হাজার ৮৯৭ জন রোগী।

হাসপাতালে যাওয়া রোগীদের বেশির ভাগই পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু।

অধিকাংশ রোগী অর্থাৎ, ৯১ শতাংশ ১ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু যা কিনা এ বয়সী শিশুদের মধ্যে বড় ধরনের রোগ প্রতিরোধ ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়।

এখন যখন সর্বমহলে এটি নিয়ে ব্যাপকভাবে প্রশ্ন উঠছে তখন দেশব্যাপী এক ডোজ টিকাদান ক্যাম্পেইন পরিচালিত হচ্ছে। এই ক্যাম্পেইনটি ২০ এপ্রিল ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে আগামী ১০ মে ২০২৬ পর্যন্ত চলবে।

যদিও WHO বলছে এ প্রাদুর্ভাবের আগে বাংলাদেশ হাম নির্মূলের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করছিল। হাম প্রতিরোধী টিকার প্রথম ডোজের কাভারেজ ২০০০ সালে ছিল ৮৯ শতাংশ। ২০১৬ সালে তা বেড়ে হয় ১২১ শতাংশ।

পরীক্ষাগারে নিশ্চিত হাম রোগীর হার দ্রুত কমে এসেছিল। কিন্তু, ২৪-২৫ সালে দেশে এমআর টিকার জাতীয় পর্যায়ের ঘাটতির কারণে টিকার প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ বা এমআর১ ও এমআর২ কাভারেজ কমে যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিয়মিত টিকাদানের ফাঁক। ২০২০ সালের পর নিয়মিত দেশব্যাপী সম্পূরক টিকাদান কর্মসূচী না থাকার কারণেই প্রকৃত অর্থে সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা শিশুর সংখ্যা বেড়েছে এবং বর্তমান প্রাদুর্ভাব তৈরি হয়েছে।

প্রাদুর্ভাব থামাতে যেকোনো জনগোষ্ঠীর অন্তত ৯৫ শতাংশ মানুষকে দুই ডোজ টিকার আওতায় আনা জরুরি।

বিশ্বব্যাপী শিশু সুরক্ষার নিরিখে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (GAVI) কাজ করে যাচ্ছে। টিকা ও টিকাদানের জন্য বৈশ্বিক এই জোটের উদ্যোগ তাই প্রশংসার দাবিদার।

ভ্যাকসিন অ্যালায়েন্স ২০২৬-৩০ মেয়াদে ৫০ কোটি শিশুকে টিকার আওতায় আনার লক্ষ্য নিয়েছে, যার জন্য তারা ৯ বিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠনের পরিকল্পনা করছে।

তবে এসব লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জও রয়েছে। যারা টিকার একটি ডোজও পায়নি, তাদের খুঁজে বের করে টিকা নিশ্চিত করা। ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে টিকায় অনিচ্ছা যে অভিভাবকদের তাদের বোঝানো। একটি সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো সমাধান করা যেতে পারে। যদি সরকারি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে ইউনিসেফ ও গ্যাভি-র মতো সংস্থার কারিগরি সমন্বয় জোরদার করা যায় তাহলে সেটি একটি সমাধান প্রক্রিয়া হতে পারে। এছাড়াও ই-হেলথ কার্ডের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুর টিকাদান নিশ্চিত করা। এগুলোর পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বাড়ানো। যদিও হামকে শ্বাসতন্ত্র আক্রমণকারী উচ্চ সংক্রামক রোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এবং বিভিন্ন সময় WHO এটাকে শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে অভিহিত করে আসছে। কিন্তু, নিঃসন্দেহে এটি টিকার মাধ্যমে শতভাগ প্রতিরোধযোগ্য।

হামমুক্ত বাংলাদেশ গড়া কোনো একক সংস্থার কাজ নয়। এটি অবলীলায় একটি জাতীয় অঙ্গীকার। ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং গ্যাভির মতো সংস্থার কারিগরী সহায়তায় এবং সরকারের নেতৃত্বে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই আমরা আমাদের শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ বিশ্ব নিশ্চিত করতে পারি।

unicef
সকল শিশুর জন্য

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হাম নির্মূল কেবল স্বাস্থ্যগত কোনো ইস্যু নয়, বরং আগামীর সমৃদ্ধ রাষ্ট্র বিনির্মাণের একটি অপরিহার্য ধাপ।